শেরপুর জেলার আবহমানকালের সাহিত্য সংস্কৃতির কথা

-তালাত মাহমুদ
কবি, সাংবাদিক ও কলামিস্ট

প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি সীমান্তকন্যা গারো পাহাড়ের সুষমা-মন্ডিত, আদি ব্রহ্মপুত্রের উর্বর পলিমাটির সোঁদাগন্ধ মাখা আর আষাঢ়ে শ্রাবণে আসাম ও মেঘালয় ছুঁয়ে নেমে আসা রোধিচ পাবর্ত্যাশ্রুর সৌন্দর্যের নান্দনিক ঝর্ণাধারায় কাঁদাজল বিধৌত সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলে আকীর্ণ হাজার বছরের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারক, দেশের ছোট্ট সুন্দর ও প্রান্তিক জেলা শেরপুর অতি প্রাচীনকালে কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোগল সম্রাট মহামতি আকবরের শাসনামলে এই পরগনা 'দশকাহনীয়া বাজু' নামে পরিচিত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভাওয়াল গাজীরা ঈশা খাঁর বংশধরদের কাছ থেকে দশকাহনীয়া পরগনা দখল করে নেন। গাজী বংশের শেষ জমিদার বহুল আলোচিত ও সংসার ত্যাগী সাধক সিদ্ধপুরুষ শেরআলী গাজীর নামানুসারে দশকাহনীয়ার নামকরণ হয়-শেরপুর। ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলায় উন্নীত হলে শেরপুর ময়মনসিংহের অন্তর্ভুক্ত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই শেরপুরে ফৌজদারী কোর্ট ও থানা স্থাপিত হয়। ময়মনসিংহ পৌরসভা স্থাপিত হওয়ার একদিন আগে ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ জুন শেরপুর পৌরসভা স্থাপিত হয়। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে শেরপুরে টেলিগ্রাফ অফিস এবং ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে মুন্সেফ কোর্ট চালু হয়। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়া একাডেমী, ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে সাপমারী হাইস্কুল, ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে চন্দ্রকোণা রাজলক্ষ্মী উচ্চ বিদ্যালয়, ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে জি.কে.স্কুল এবং ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে নালিতাবাড়ী হিরন্ময়ী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিক নিদর্শনের মধ্যে গড়জরিপার দুর্গ (১৪৮৬-১৪৯১), দরবেশ জরিপ শাহর মাজার, বার দুয়ারী মসজিদ, হযরত শাহ্ কামালের মাজার (১৬৪৪), শেরআলী গাজীর মাজার, কসবার মোগল মসজিদ, ঘাঘরা লস্কর বাড়ি মসজিদ, মাইসাহেবা মসজিদ, বিলুপ্ত নয়আনি জমিদার বাড়ি, আড়াইআনি জমিদার বাড়ি, পৌনে তিনআনি জমিদার বাড়ি, নালিতাবাড়ি রাণী সুতানলী দীঘী, নকলা উপজেলার নারায়ণখোলা গ্রামে হাজার বর্ষী বেড় শিমুল গাছ, পাঠাকাটার নীলকুঠি এবং রুণীগাঁয়ের গায়েবী মসজিদ (মতান্তরে সমাধি) উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ৮ জানুয়ারি শেরপুর থানা থেকে মহকুমা এবং ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি জেলায় উন্নীত হয়। ১৩৬৩.৭৬ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট শেরপুর জেলা নকলা, নালিতাবাড়ি, শ্রীবরদী, ঝিনাইগাতী ও শেরপুর সদর এই পাঁচটি উপজেলা নিয়ে গঠিত। পৌরসভা ৪টি। ইউনিয়ন ৫২টি। লোকসংখ্যা প্রায় ১৮ লাখ। শিক্ষার হার প্রায় ৫০ শতাংশ। অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, মৃগী, মালিঝি, ভোগাই, চেল্লাখালী, মহারশি প্রভৃতি নদ-নদী বিধৌত শেরপুর জেলায় রবি শস্যের পাশাপাশি প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। শেরপুরের উদ্বৃত্ত খাদ্য-শস্য দিয়ে দেশের মোট খাদ্য ঘাটতির ১৫% পূরণ হয়ে থাকে। জেলায় পাঁচ শতাধিক রাইস মিল রয়েছে। যোগাযোগের মাধ্যম একমাত্র সড়ক পথ। উল্লেখ্য, সেকালে ইংল্যান্ডের ডান্ডি ও কলকাতার সাথে শেরপুর ও চন্দ্রকোণার সরাসরি নৌ-যোগাযোগ ছিল। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জুন এ জেলায় বড় মাত্রার ভূমিকম্পের ফলে ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ পশ্চিম দিকে সরে গিয়ে যমুনা নদীর সাথে মিশে যায় এবং অসংখ্য দালানকোঠা, ঘর-বাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এতে শেরপুরের ভৌগোলিক মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটে। দেশের ভ্রমণ পিপাসুদের অন্যতম তীর্থ পর্যটন কেন্দ্র শেরপুরের দীপ্ত অহঙ্কার ঝিনাইগাতীর গজনী অবকাশ কেন্দ্র, সন্ধ্যাকুড়ার রাবার বাগান, নালিতাবাড়ীর মধুটিলা ইকোপার্ক, রাবার ড্যাম এবং নাকুগাঁও স্থল বন্দর প্রকৃতিপ্রেমীদের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের খুব কাছাকছি নিয়ে যায়। বিশেষ করে গজনী অবকাশ কেন্দ্রের পাহাড়ের চূঁড়ায় স্থাপিত সুউচ্চ টাওয়ারের উপরে উঠলে যেমন ভাসমান মেঘের ছোঁয়া লাগে তেমনি প্রতিবেশী দেশ ভারতের মেঘালয় রাজ্যের বিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চল অবলোকন করা যায়। চারদিকে শুধু সবুজের সমারোহ আর দলবদ্ধ বুনোহাতির আনাগোনা সে এক অন্যরকম অনুভূতি। শেরপুর প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি,

রাজনীতি আর আন্দোলন সংগ্রামে গোটা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, আর আদিবাসী গারো, হদি, কোচ, হাজং, সাঁওতাল, বানাই, ডালুসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ভূক্ত মানুষের মাঝে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সেই প্রাচীনকাল থেকে আজোবধি সাদৃশ্য বর্তমান। হাজার বছরের সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারার সাথে সকল ধর্মের, সকল গোত্রের মানুষ একই কাতারে সামিল হয়েছে আপত্য স্নেহ আর অনাবিল ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে। যে সব মনীষীর অবিমিশ্র সরব কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে শেরপুরের ঐতিহ্য স্ফীত হয়েছে, তাদের মাঝে জরিপ শাহ্, মজনু শাহ্ পাগল, টিপু শাহ পাগল, শাহ কামাল, শেখ কাদের ইয়েমেনী, শেখ বোরহানউদ্দিন, বুড়াপীর, ছাওয়াল পীর, খাজাবাবা ফরিদপুরীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসব পীর-এ-কামেল, অলী-আওলিয়ার জন্ম ও আগমনে এতদাঞ্চলে শরিয়তী, মারেফতী, দেহতত্ত্ব, মুর্শিদী ও মরমী সঙ্গীতের মাধ্যমে ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। একই সাথে সনাতন ধর্মালম্বীরাও নানা পূজা-পার্বনে যেসব উৎসবের আয়োজন করে তাতে সকল ধর্ম ও গোত্রের মানুষ বহুকাল পূর্ব থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনন্দ উপভোগ করে আসছে। এছাড়া জারি, সারি, ভাওয়াইয়া, পল্লীগীতি নানান উৎসবগীতি, পালাগান ও দলীয় সঙ্গীতে ভরপুর শেরপুরের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি আবহমানকাল থেকেই এ অঞ্চলের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার চিত্ত-বিনোদনের অনন্য সাধারণ উপাদান হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে। পাশাপাশি হা-ডু-ডু, দাড়িয়াবান্ধা, ঘোড়দৌড়, নৌকা বাইচ, ষাঁড়ের লড়াই, লাঠিখেলা, ফুটবল, ভলিবল, ছি-কুৎ-কুৎ প্রভৃতি খেলার আজও জেলার সর্বত্র প্রচলন রয়েছে। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে শেরপুর বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে নানা ছলচাতুরী, প্রহসন আর বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে ইংরেজ শাসকরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে দিয়ে ভারতে তাদের সাম্রাজ্যের সূচনা করে। শুরু হয় প্রায় দু'শ বছরের পরাধীনতার ঘৃণ্য ইতিহাস। সেইসাথে চলে ইংরেজ প্রভূত্বের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর সশস্ত্র সংগ্রামের শোণিতধারা। শেরপুরেও সেই আন্দোলন ও সংগ্রামের বহ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। ১১৭৬ বঙ্গাব্দে (১৭৬৯-৭০ খ্রি:) বাংলা এবং বাংলা সন্নিহিত প্রদেশগুলোতে এক তৃতীয়াংশ লোক দুর্ভিক্ষে মারা যায়। সে দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে খ্যাত। ছিয়াত্তরের ভয়াবহ বিয়োগান্তক ও মর্মস্পর্শী মন্বন্তরের সময় অত্যাচারী ইংরেজ শাসক ও তাদের রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শেরপুরসহ সমগ্র উত্তরবঙ্গের দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমান কৃষকরা বিদ্রোহ করেছিল। এ বিদ্রোহ প্রায় তিন দশক ধরে চলে। বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সন্যাসী ও ফকিররা। তাদের নেতাদের সাঝে প্রধান ছিলেন মজনু শাহ ও ভবানী পাঠক। সন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে। ওয়ারেন হেস্টিংয়ের সময় থেকে লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময় পর্যন্ত শেরপুরে ফকির ও সন্যাসীদের নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এ সময় ফকির ও পাগলপন্থী নেতা টিপুশাহ ক্যাপ্টেন টমাসকে হত্যা করে শেরপুরে বাংলার প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং গড়জরিপায় রাজধানী স্থাপন করেন। উল্লেখ্য, সুসং দুর্গাপুর পরগনার পূর্ব প্রান্ত থেকে শেরপুর পরগনার পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত (দৈর্ঘ্যে ১০০ মাইল এবং প্রস্থে ৭০ মাইল) এই বিস্তীর্ণ এলাকা ছিল আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। টিপুশাহের নেতৃত্বে শেরপুরসহ সমগ্র উত্তর ময়মনসিংহে সংঘটিত গারো বিদ্রোহের পরিচালনায় ছিলেন শিবরাজ পাথ¦র ও ধুবরাজ পাথ¦র। এরা দুই ভাই শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ির সন্তান ছিলেন। ১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ওয়াহাবী আন্দোলন, ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দের ফরায়েজী আন্দেলন, ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ, ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কৃষক বিদ্রোহসহ ভারতবর্ষের অসংখ্য ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন সংগ্রাম ও বিদ্রোহের সাথে শেরপুরের নাম ওঁৎপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে ও ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে খোশ মামুদ চৌধুরীর নেতৃত্বে শেরপুরের কামারের চরে কৃষক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শেরেবাংলা এ, কে, ফজলুল হক তখন জামালপুর মহকুমার এসডিও ছিলেন। তিনি ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের

কৃষক মহাসম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী এসময় শেরপুরে শিক্ষকতা করেন এবং গোপনে কৃষক ও সাধারণ মানুষকে বৃটিশ বিরোধী আন্দেলনে সংগঠিত করেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ অঞ্চলে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে নানকার বিদ্রোহ, ভাওয়ালী বিদ্রোহ, টংক আন্দোলন, মহাজন বিরোধী আন্দোলন, ইজারাদারী ও জমিদারী প্রথা বিরোধী আন্দোলন সংঘটিত হয়। শেরপুরের যেসব কৃতী সন্তান বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের মাঝে বিপ্লবী রবি নিয়োগী (আন্দামান ফেরত) বিপ্লবী নগেন্দ্র চন্দ্র মোদক (আন্দামান ফেরত), বিপ্লবী আফসার আলী খান, বিপ্লবী মন্মথ দে, বিপ্লবী জ্যোৎস্না নিয়োগী, বিপ্লবী তুলশী বক্সী, বিপ্লবী বেলাপাল, বিপ্লবী দ্বীজেন্দ্র কিশোর মজুমদার, বিপ্লবী জলধর পাল, বিপ্লবী সচী রায়, প্রমুখের নাম প্রাতঃস্মরণীয়। এছাড়া তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের ডেপুটি স্পীকার ছিলেন খান বাহাদুর ফজলুর রহমান। বিভিন্ন সরকারের আমলে শেরপুর জেলা থেকে মন্ত্রী হয়েছেন যথাক্রমে খোন্দকার আব্দুল হামিদ, অধ্যাপক আব্দুস সালাম, বেগম মতিয়া চৌধুরী এবং আলহাজ্ব রেজাউল করিম হীরা। জাতীয় সংসদের হুইপ ছিলেন আলহাজ্ব জাহেদ আলী চৌধুরী। বর্তমানে কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, জাতীয় সংসদের হুইপ আতিউর রহমান আতিক ও ইঞ্জিনিয়ার ফজলুল হক চাঁন মহাজোট সরকারের জাতীয় সংসদ সদস্য। উল্লেখ্য, অ্যাডভোকেট আনিছুর রহমান এমএনএ ও গভর্ণর ছিলেন এবং মোঃ নিজাম উদ্দিন আহম্মেদ রাজনীতিক ও এমপি ছিলেন। শেরপুর জেলা পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন খোন্দকার মুহাম্মদ খুররম এমপি। তৎকালে শেরপুর জেলায় শিক্ষা বিস্তারে যারা আত্মনিবেদিত ছিলেন তাদের মাঝে পদার্থ বিজ্ঞানী ড. মোসলেহ উদ্দিন, রোহিনী কান্ত হোড়, অধ্যক্ষ সৈয়দ আবদুল হান্নান, মোঃ ইউসুফ মিয়া, মৌলভী সৈয়দ আহমেদ, আলীম উদ্দিন আহমেদ, কুলু রঞ্জন গোস্বামী, আতাউর রহমান (আতর আলী মাষ্টার), মাহবুবুর রহমান বিএসসি, আমজাদ হোসেন, নগেন্দ্র পাল প্রমুখ। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনেও শেরপুরের বিশেষ অবদান রয়েছে। এ জেলায় অর্ধশতাধিক ভাষা সৈনিক রয়েছেন। শেরপুর জেলায় তালিকাভূক্ত ১৬৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান বিভক্তির পর থেকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) অধিবাসীরা সকল প্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। এমনকি বাঙালীদের মাতৃভাষার উপরও আঘাত আসে। যে কারণে চির সংগ্রামী বাঙালী জাতি ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে গণ-অভ্যুথান এবং ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধে পঙ্গপালের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। এসব আন্দোলন সংগ্রামে শেরপুরের মানুষ বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে শেরপুর ও কামালপুরের রণাঙ্গণের বীরত্ব গাঁথা বিশ্ববাসীর কাছে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। কামালপুরের যুদ্ধে সেক্টর কমান্ডার কর্ণেল তাহের গুরুতর আহত হন এবং একটি পা হারান। শেরপুরে বেশ কয়েকটি মুক্তিযুদ্ধের বধ্যভূমি ও গণকবর রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ঝিনাইগাতী আহম্মদনগর ও কয়া রোড বদ্ধভূমি, শেরপুর সদর উপজেলার ঝাউগড়া বধ্যভূমি ও নালিতাবাড়ির বিধবা পাড়া বধ্যভূমি। এছাড়া গণকবর ২টি ও স্মৃতি ফলক ২টি। শেরপুরে তিনজন বীর মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় খেতাবে ভূষিত হন। এরা হলেন শহীদ শাহ্ মুতাসিম বিল্লাহ্ খুররম (বীর বিক্রম) ,জহুরুল হক মুন্সী (বীর প্রতীক,বার) ও ডা. মাহমুদুর রহমান (বীর প্রতীক) । বাঁচার মত বাঁচা, সুন্দর করে বাঁচার নাম সংস্কৃতি। রাজনীতি সংস্কৃতির জন্যই। আন্দোলন-সংগ্রাম বিদ্রোহ যুদ্ধ বিগ্রহ রাজনীতি থেকে উৎসারিত। জীবন ও রাজনীতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। শেরপুরের সাহিত্য, সাংস্কৃতি ও সাংবাদিকতার ইতিহাস অত্যন্ত পুরনো। প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে শেরপুরের বুকে জন্ম গ্রহণকারী কবি ও সাহিত্যিকগণ যুগান্তকারী অবদান রেখে গেছেন। নতুন প্রজন্মের প্রতিশ্রুতিশীল কবি-সাহিত্যিকরাও সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছেন। ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনকল্পে জমিদার হরচন্দ্র রায় চৌধুরী ও

মহাপ-িত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রতিষ্ঠা করেন ‘বিদ্যোন্নতি সাহিত্য চক্র’। জমিদার হরচন্দ্র রায় চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘বিদ্যোন্নতিসাধিনী’ নামে একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। মহাপ-িত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার এ পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। ‘চারুপ্রেস’ নামে ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের প্রথম মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয় শেরপুরে। এই ছাপাখানাকে ঘিরে সাহিত্য বিকাশের পাশাপাশি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রও তৈরী হয় শেরপুরের মাটিতে। জমিদার হরচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদিত “সাপ্তাহিক চারুবার্তা” পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে এই চারুপ্রেস থেকে। সাপ্তাহিক চারুবার্তা ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ‘সাপ্তাহিক বিজ্ঞাপনী সংবাদ’ প্রকাশিত হয় শেরপুর বিজ্ঞাপনী প্রেস থেকে। জমিদার হরচন্দ্র রায় চৌধুরী ও জমিদার হরিকিশোর রায় চৌধুরী ‘সাপ্তাহিক বিজ্ঞাপনী সংবাদ’ পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আর সম্পাদক ছিলেন শ্রী জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী। তখনকার আমলে জমিদার হরচন্দ্র রায় চৌধুরী নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করেন ‘হেমাংগ লাইব্রেরী’। লাইব্রেরীতে প্রায় ৩০ হাজার বই ছিল। হরচন্দ্র রায় চৌধুরী বাংলা, সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী ও ইংরেজী ভাষায় সুপ-িত ছিলেন। তার গ্রন্থাবলী- উপাসনোল্লাসিনী, শ্রীবৎস উপাখ্যান, শেরপুর বিবরণী, (১৮৭২) বংশানুচরিত, (১৮৮৬) জীবনের নশ্বরত্ব, শেরপুরের বংশাবলী, মানুষের মহত্ব, ভারতবর্ষীয় আর্য্য জাতির কর্মকা- ইত্যাদি। স্মর্তব্য, প্রথম পাগলপন্থী নেতা ও গারো বিদ্রোহের মহানয়াক টিপু শাহকে ‘লুই ব্ল্যাংক অব বেঙ্গাল’ উপাধী দিয়ে জমিদার হরচন্দ্র রায় চৌধুরী নিজেই মহান বিপ্লবীর ভূমিকা পালন করেছেন। শেরপুর শহরের বাগরাক্সায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন মহাপ-িত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার। তিনি কলকতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছাড়াও পাঞ্জাব ইউনির্ভাসিটির গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত উপাধী পরীক্ষার পরীক্ষক এবং এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গাল এর সদস্য পদের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সমূহে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ’সতী পরিণয়’ শিশুশিক্ষা ও প্রাথমিক পাঠশালাসহ ৩১টি গ্রন্থ রচনা করে গোটা বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। পন্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার বেদ শাস্ত্রের উপর বিশেষজ্ঞ ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শেরপুর থেকে বেশকিছু কাব্যগ্রন্থ প্রাকাশিত হয়। রামনাথ বিদ্যাভূষণের সংখ্যামতে শ্রী মদভগবত গীতার পদ্যানুবাদ। শেরপুরের জমিদার রায় বাহাদুর রাধাবল্লভ চৌধুরীর হরিনাম নিকুঞ্জ রহস্য গীতিকা, রাগানুগাদীপিকা, বিষ্ণুর দ্বাদশ যাত্রা পদ্ধতি ও শ্রী রাধা গোবিন্দের দ্বাদশ মহোৎসব পদ্ধতি। হরচন্দ্র তর্করতেŔর উপদেশ শতকম, অত্রি সংহির্তা, হারিত সংহির্তা, বিষ্ণু সংহির্তার অনুবাদ। জমিদার হরগোবিন্দ লষ্করের রাবন বধ কাব্য ও দশাশ্বমেধ কাব্য। হিরন্ময়ী চৌধুরাণীর পুষ্পাধার। কিশোরী মোহন চৌধুরীর কুসুমকুরক কাব্যগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। ময়মনসিংহ ও শেরপুর অঞ্চলে ব্রক্ষ্মধর্ম প্রচার কাজে নিয়োজিত থাকাকালে গীরিশ চন্দ্র সেন পবিত্র কোরআন শরীফ বঙ্গানুবাদ করেন। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে কোরআন শরীফের বঙ্গানুবাদকৃত প্রথম পারা ছাপা হয় শেরপুরের চারুপ্রেস থেকে। অমর কথাশিল্পী মীর মোশাররফ হোসেনের বিখ্যাত বিষাদসিন্ধু গ্রন্থটিও প্রথম ছাপা হয় চারুপ্রেস থেকে ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে শেরপুরের বুকে জন্ম নিয়ে আবহমানকালের বাংলা সাহিত্যকে যারা সমৃদ্ধ করেছেন তাদের মাঝে বিজয় চন্দ্র নাগের নাগ বংশের ইতিবৃত্ত (১৯২৯) ফজলুর রহমান আরজনবীর প্রেমের খনি ও ধর্মবান। করিম বক্সের চতুরঙ্গ কাহিনী। মুন্সি বসিরউদ্দিনের শাহাদতনামা এবং কুমার চৌধুরী ও জিতেন সেনের মত আরো অনেকে সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করে শেরপুরের লোকগাঁথা ও পুঁথি সাহিত্যকে বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এছাড়া খালেকদাদ চৌধুরী রচিত শেরপুরের ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বলিত নাটক- ‘রক্তাক্ত অধ্যায়’ অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেনের শেরপুরের ইতিকথা (১৯৬৯) ও পন্ডিত ফসিহুর রহমানের শেরপুর জেলার অতীত ও বর্তমান (১৯৯০), সাপ্তাহিক শেরপুর সম্পাদক কবি আবদুর রেজ্জাকের আমাকে বলতে দাও (কাব্য), চলার পথে, বড় একা একা লাগে ও শেষ দেখা (উপন্যাস), সাপ্তাহিক চলতি খবর সম্পাদক এডভোকেট জাকির হোসেনের বাংলার মানুষ (নাটক) সুনীল বরণ দের

সর্বহারা (নাটক), মিনা ফারাহ'র জাহান্নাম বাড়ির ভূত, বনমালী তুমি পরজনমে হইও রাধা, নারীর জীবন যৌবন বার্দ্ধক্য ও ডিভি'র ফাঁদে লোবান আলী, সাংবাদিক সুশীল মালাকারের পদ্মাবতী (উপন্যাস), সাদিকুর রহমানের ছাইকালো মেয়ে (উপন্যাস), তালাত মাহমুদের গ্রন্থাবলী স্বর্গের দ্বারে মর্তের চিঠি (১৯৭৫), গীতিলতিকা (ঢাঃ বিঃ ১৯৭৯) লোকহীন লোকরণ্য (২০০৪), সংবাদপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত-উদাম গতরী ন্যাংটা বয়ান, নিয়ম ভাঙার নিয়ম, টাউট মুক্ত সমাজ চাই, শতাব্দীর শুরুতে বিপন্ন বিশ্ব, দ্বিতীয় চিন্তা তৃতীয় মত, হৃদয় থেকে নেয়া ইত্যাদি। বিভা সরকারের ভালোবাসার ক্রীতদাস নই (কাব্য), মুখলেছুর রহমান ফকিরের রাখাল হলো রাজা (নাটক), অধ্যাপক আজিজুল হকের মানবীয় মতবাদ ও ইসলাম (গবেষণা), আবদুর রহমানের সুখ ঘাতক (উপন্যাস), শেরআলী গাজী (নাটক), রথী মহারথী (নাটক), উদয় শংকর রতনের নিসর্গের নীল খামে (কাব্য), মুকুল পাহাড়ীর গ্রন্থ ছাপ্পান্ন বছরের দুর্নাম সহ কয়েকটি গ্রন্থ, মনিরুজ্জামান ফেরদৌসের সোনার হরিণ সুখ (উপন্যাস), নূর ইসলাম মনির কাব্যগ্রন্থ হাজার সুরের প্রতিধ্বনি (১৯৯০), আনছার আলীর শান্তির দেশ লিবিয়া (ভ্রমণ কাহিনী), অধ্যাপক ড. সুধাময় দাসের গবেষণা গ্রন্থ বাংলা উপন্যাসে জাতীয়তাবোধ, আনিছুর রহমান রিপনের কাব্যগ্রন্থ কষ্টে আছি প্রিয়তমা (১৯৯৬), রবিন পারভেজের কাব্যগ্রন্থ দৃশ্যের ওপাশে চিহ্নের আড়ালে (১৯৯৯) সাপ্তাহিক দশকাহনীয়া সম্পাদক মুহাম্মদ আবু বকরের ক্ষয়িষ্ণু আবু (কাব্য), লুলু আব্দুর রহমানের ছড়ার বই লাল ঘোড়া টকবগ (১৯৯৮) ও ভূত পেতRীর ছা (২০০২), খোরশেদ আলমের উপন্যাস উর্মির বুকে সাগর (২০০৭), মাসুদুজ্জামান উৎসবের ভালবাসা কেন কাঁদায় (উপন্যাস) হাদিউল ইসলামের কাব্য গ্রন্থ দুলোকালস্রোত (২০০৪), কোহীনূর রুমা'র কাব্যগ্রন্থ নীল উপাখ্যান (২০১২), দেলোয়ার হোসেনের কাব্যগ্রন্থ প্রথম ফুল (২০১২), অধ্যাপক আবু তাহের সম্পাদিত ওস্তাদ অবিনাশ গোস্বামী স্মারক গ্রন্থ (২০১২)।

এছাড়া শেরপুরে জন্ম গ্রহণ করে জাতীয় পর্যায়ে যারা বিশেষ অবদান রেখে গেছেন এবং এখনো রেখে যাচ্ছেন- তারা হলেন, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কালজয়ী সাংবাদিক, দৈনিক ইত্তেফাকের মঞ্চে নেপথ্যে কলামের স্পষ্টভাষী, রাজনীতিক ও মন্ত্রী খোন্দকার আবদুল হামিদ, শিশুতোষ সাহিত্যিক প্রাবন্ধিক, রাজনীতিক ও রাষ্ট্রদূত সৈয়দ আবদুস সুলতান, সাবেক মন্ত্রী ও গবেষক অধ্যাপক আবদুস সালাম, বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও একুশে পুরস্কারপ্রাপ্ত নাট্যকার, অভিনেতা, চলচ্চিত্র পরিচালক, বিটিভির সাবেক ডিজি আবদুল্লাহ আল-মামুন। দৈনিক সংবাদের সম্পাদক বজলুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও বর্তমানে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) চেয়ারম্যান ড. গোলাম রহমান রতন, সাপ্তাহিক তকবীরের সম্পাদক আজিজুর রহমান, সাপ্তাহিক নবজাগরণের সম্পাদক এডভোকেট আবুল কাশেম, জাতীয় সাহিত্য সংগঠন 'লেকশি'র সভাপতি, ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে সাড়া জাগানো "জিলবাংলা সাহিত্য পুরস্কার" প্রাপ্ত আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবি, সাংবাদিক ও কলামিস্ট এবং দৈনিক ঢাকা রিপোর্ট-এর সিনিয়র সহকারী সম্পাদক তালাত মাহমুদ, এটিএন বাংলার এডিটর ইন চিফ মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, অধুনালুপ্ত দৈনিক অবজারভারের সিনিয়র সহকারী সম্পাদক আশরাফ আলী, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) এর সাবেক চিফ রিপোর্টার আনোয়ার হোসাইন মঞ্জু, কবি, ছড়াকার ও গল্পকার সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, কবি সৈয়দ শওকত আলী, কবি শাহজাদী আঞ্জুমান আরা মুক্তি, কলামিষ্ট ও প্রাবন্ধিক বিরুপাক্ষ পাল, সাংবাদিক সুভাষ চন্দ্র বাদল (বাসস), সাপ্তাহিক জীবন এর সম্পাদক অধ্যাপক আবদুর রউফ, কবি ও প্রাবন্ধিক ড. সৌমিত্র শেখর দে, আলোকচিত্রি শাহরিয়ার রিপন , কবি ও গীতিকার আসাদুজ্জামান, চট্টগ্রাম বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগারের প্রধান গ্রন্থাগারিক মোহাম্মদ হামিদুর রহমান, কবি আরিফ হাসান প্রমুখ।

শেরপুরের সাহিত্য জগতের অপরাপর কলম সৈনিকদের মধ্যে অধ্যাপক আবু তাহের, প্রফেসর মোঃ মজিবর রহমান, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও প্রবীণ শিক্ষক মহসীন আলী, মোস্তফা কামাল, মোস্তাক

হাবীব, গঙ্গেশ চন্দ্র দে, রাধা বিনোধ দে, অধ্যক্ষ আক্তারুজ্জামান, রনজিত নিয়োগী, রাজিয়া ছামাদ, জোবায়দা খাতুন, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান, মোতাহার খালেদ, বৃতেন্দ্র মালাকার, বিজন চক্রবর্তী, দুলাল দে বিল্লব, কমল চক্রবর্তী, ক্ষমা চক্রবর্তী, শাহরিয়ার রিপন, ড. আব্দুল আলিম তালুকদার, মলয় মোহন বল, মুগনিউর রহমান মনি, রফিকুল ইসলাম আধার, শিব শংকর কারুয়া, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ভূট্টো, রবেতা ম্রং, গোলাম রাব্বানী, শাহরিয়ার মিল্টন , আব্দুর রফিক মজিদ, কাকন রেজা, আইরিন আহমেদ লিজা, আতিয়া রহমান কনিকা, লতিফা হক শ্যামা, সন্ধ্যা রায়, মোহাম্মদ নাছির, খন্দকার রাশেদুল হক, অনির্বান হারুন, শাহীন খান, মোঃ শাহ আলম, খায়রুল ওয়ারা, শাহ আলম বাবুল, প্রাঞ্জল এম সাংমা, জ্যোতি পোদ্দার, আছমা জামান, সাজ্জাদ মাহমুদ মমিন, হাসানুজ্জামান শরাফত, গীতিকার আজিজুর রহমান সরকার, মনিরুজ্জামান মনির, গীতিকার আজিজুল হক, কে এ নিউটন, এমদাদুল হক রিপন, রফিকুল ইসলাম, হাসানুজ্জামান বুলবুল, খন্দকার মোস্তফিজুর রহমান, শ্যামল বণিক অঞ্জন, কামরুন নাহার জ্যোতি, মোস্তফা হোসাইন, মেহেদী আহসান, পলাশ আহম্মেদ, স্বজন বিবাগী, রতÑাকর, শিশু ছড়াকার হোসনে তানসেন মাহমুদ ইলহাম ও শিশু কবি রাশিকা জান্নাত মারিয়া সহ আরও অনেক কবি-সাহিত্যিকের আবির্ভাবে শেরপুরের সাহিত্যাঙ্গন আজ মুখরিত। গত তিন যুগে শেরপুর থেকে অনেক সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে অধ্যাপক আবু তাহের সম্পাদিত সঞ্চরণ, মহসীন আলী সম্পাদিত উত্তরণ, সুশীল মালাকার সম্পাদিত প্রবাহ, রবিন পারভেজের সম্পাদনায় মানুষ থেকে মানুষে ও রাঁ, সঞ্জীব চন্দ বিল্টু সম্পাদিত সাহিত্যপত্র বোধন, আরিফ হাসান সম্পাদিত সাহিত্যলোক, নকলা থেকে প্রকাশিত মরহুম কামরুজ্জামান মুকুল সম্পাদিত সাহিত্যাঙ্গন, মুগনিউর রহমান মনি সম্পাদিত সপ্তডিঙ্গা মধুকর, হাকিম বাবুল সম্পাদিত শেরপুর উপজেলা প্রোফাইল, কবি সংসদের মূখপত্র বালার্ক, নালিতাবাড়ী থেকে প্রকাশিত রুকুনুজ্জামান অঞ্জন সম্পাদিত মাসিক সংলাপ, শ্রীবরদী থেকে প্রকাশিত মাজিদুর রহমান শাহীন সম্পাদিত নোলক উল্লেখযোগ্য। এছাড়া জামালপুর ও শেরপুর জেলার সৃজনশীল সাহিত্য সাময়িকী হিসেবে তালাত মাহমুদের সম্পাদনায় ‘আমরা তোমারই সন্তান’ ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। জেলার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোও বিশেষ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। ২০০০ সাল থেকে শেরপুরে প্রতিবছর কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এছাড়া যুব সম্মেলন, নারী সম্মেলন এবং গণিত সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শেরপুর জেলায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার যে পরিবেশ গড়ে উঠেছে উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা পেলে অতীত ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা আরও সমৃদ্ধ করা সম্ভব হবে। বর্তমানে শেরপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতিক অঙ্গনে পাতাবাহার খেলাঘর আসর, শেরপুর সাহিত্য সংসদ, কবি সংসদ বাংলাদেশ, কবি সংঘ, শেরপুর সাংস্কৃতিক সংসদ, অনুপ্রাস, চন্দ্রবিন্দু থিয়েটার, রূপান্তর থিয়েটার ইত্যাদি সংগঠন যথারীতি দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে লেখক, কবি, নাট্যশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী ও নৃত্যশিল্পীর। সঙ্গীতে কানু সেন গুপ্ত, ওস্তাদ অবিনাশ গোস্বামী, বিজন ঘোষ, নিরঞ্জন দে, মরহুম আমিনুল রহমান নিঝু, ওস্তাদ আতিকুর রহমান, ওস্তাদ অধ্যাপক আলিমুল ইসলাম, ওস্তাদ সঞ্চিতা হোড় দীপু, শিল্পী শফিকুর রহমান, শিল্পী মজিবর রহমান, শিল্পী আমিনুল ইসলাম লোকন (গীটার), গণসংগীত শিল্পী তপন সারওয়ার, গণ সংগীত শিল্পী নূর মোহাম্মদ, দেবাশীষ দাশ মিলন, কণ্ঠশিল্পী নির্মল কুমার দে, কণ্ঠশিল্পী মুক্তি দত্ত, কণ্ঠশিল্পী স্বরলিপি দত্ত। নৃত্যে ওস্তাদ মোশারফ হোসেন, ওস্তাদ কমল কান্তি পাল, তবলায় উদয় শংকর সাহা, রতন সাহা এবং নাট্যকলায় লুৎফর রহমান মোহন, বিজন চক্রবর্তী, শিব শংকর কারুয়া, বিমল কর্মকার ও মালিক ফখরুদ্দিন (মরহুম), আলোকচিত্রি নীতিশ রায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জেলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পৃষ্ঠপোষণায় শেরপুর চেম্বর অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাস্ট্রি এর সভাপতি গোলাম মোহাম্মদ কিবরিয়া লিটন, বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্ব ইদ্রিস মিয়া, বাবর এন্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ আবুল হাসেম, আমিন এন্ড কোং এর ব্যবস্থাপনা

পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ বজলুর রহমান বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছেন। উল্লেখ্য, সুরেন্দ্র মোহন সাহা এককালে শেরপুরে দানবীর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। শেরপুর জেলায় দু'টি দৈনিক ও ছয়টি সাপ্তাহিক পত্রিকা রয়েছে। তন্মধ্যে কবি আব্দুর রেজ্জাক সম্পাদিত সাপ্তাহিক শেরপুর, এডভোকেট জাকির হোসেন সম্পাদিত সাপ্তাহিক চলতি খবর, মোঃ আবু বকর সম্পাদিত সাপ্তাহিক দশকাহনিয়া, কাকন রেজা সম্পাদিত দৈনিক ঘটনা (বর্তমানে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ), জাহাঙ্গীর আলম খান সম্পাদিত দৈনিক তথ্যধারা , মোঃ আতিউর রহমান আতিক (এমপি) সম্পাদিত সাপ্তাহিক কালের ডাক, ডা. মিনা ফারাহ সম্পাদিত সাপ্তাহিক জয়, মনিরুল ইসলাম মনির সম্পাদিত সাপ্তাহিক বাংলার কাগজ এবং শাহরিয়ার মিল্টন সম্পাদিত শেরপুর জেলা ভিত্তিক প্রথম অনলাইন নিউজ পোর্টাল শেরপুর টাইমস ডটকম (www.sherpurtimes.com) নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। মোঃ মেরাজ উদ্দিন সম্পাদিত সাপ্তাহিক নতুন যুগ জামালপুর ও শেরপুর জেলার মূখপত্র হিসেবে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। শেরপুর জেলার স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সাংবাদিকতায় বিপ্লবী রবি নিয়োগী, ভাষা সৈনিক হাবিবুর রহমান, সুশীল মালাকার, অধ্যক্ষ আক্তারুজ্জামান (অ্যাডভোকেট), জাকির হোসেন (অ্যাডভোকেট) , তালাপতুফ হোসেন মঞ্জু, ইমাম হোসেন ঠান্ডু (অ্যাডভোকেট), গোলাম মোস্তফা, জয়নুল আবেদীন (মরহুম), মো. ছানাউল্লাহ, শাহরিয়ার লিটন (অ্যাডভোকেট), বজলুর রহমান, আবদুর রহিম বাদল (অ্যাডভোকেট), দেবাশীষ সাহা রায়, সঞ্জীব চন্দ বিল্টু, রতন চৌধুরী, জিএম আজফার বাবুল, আমিরুজ্জামান লেবু, রফিকুল ইসলাম আধার (অ্যাডভোকেট), মোঃ মেরাজ উদ্দিন, মুগনিউর রহমান মনি, শাহরিয়ার মিল্টন, হাকিম বাবুল, অ্যাডভোকেট আবদুল্লাহ আল মামুন (মরহুম), আনিছুর রহমান বাচ্চু, এসকে সাত্তার, মোঃ হযরত আলী, মোঃ সামেদুল ইসলাম তালুকদার, গৌতম পাল, মনিরুল ইসলাম লিটন, কাকন রেজা, শওকত জামান, হাকাম হীরা, আব্দুর রফিক মজিদ, শরিফুর রহমান, আনিছুর রহমান আকন্দ, আবদুল মান্নান সোহেল, আদিল মাহমুদ উজ্জল, মুক্সিতুর রহমান হীরা, আবুল হাশিম, সাবিহা জামান শাপলা, মাসুদ হাসান বাদল, মলয় মোহন বল, মো. সুরুজ্জামান, আল হেলাল, মনিরুল ইসলাম মনির, আবু হানিফ, জিএইচ হান্নান, এম মোকাদ্দেস, দেবাশীষ ভট্টাচার্য ,সুজন সেন, আলমগীর হোসেন, মহিউদ্দিন সোহেল, আসাদুজ্জামান মোরাদ, শাহাজাদা স্বপন, সেলিম হোসেন, হারুনুর রশিদ, জাহাঙ্গীর হোসেন, আবুল কালাম আজাদ, সুমন দে, ফুয়াদ হোসেন, আব্দুল মোত্তালেব সেলিম, শফিউল আলম লাভলু ,ইউসুফ আলী, আব্দুল মান্নান সরকার, তারেক মাহমুদ রানা, আহসানুজ্জামান ফিরোজ, আরিফুর রহমান, মতিউর রহমান মধু প্রমুখ সাংবাদিকের নাম উল্লেখযোগ্য।

শেরপুর শুধু সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতেই সমৃদ্ধ নয়, প্রশাসনিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রেও বিশেষ অবদান রয়েছে। যতটুকু জানা যায়, ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এল ডিগ্রী অর্জন করে তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার শেরপুর বারে প্রথম মুসলিম আইনজীবী হিসেবে যোগদান করেন অ্যাডভোকেট আফতাবউদ্দিন আহমদ। পরবর্তী চল্লিশ বছর তিনি সুনামের সঙ্গে আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি শেরপুর বারের এক যুগের সভাপতি, শেরপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ও সরকারী উকিলের দায়িত্ব পালন করেন। পূর্ববঙ্গ হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন বদিউজ্জামান আহমেদ। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস বিচার বিভাগীয় সদস্য নিযুক্ত হন অ্যাডভোকেট মো. আমিনুল ইসলাম । জামালপুর মহকুমার সর্বপ্রথম ইপিসিএস বিচার বিভাগের সদস্য হবার দুর্লভ সম্মানের অধিকারী বিশিষ্ট এ আইনজ্ঞ দীর্ঘ ৫০ বছর সুনামের সঙ্গে আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। পশ্চিম ময়মনসিংহের প্রথম ব্যারিস্টার এ.এম রশিদুজ্জামান, বাংলাদেশের প্রথম এফসিপিএস অর্জনকারী চিকিৎসক ডা. আনোয়ারুল ইসলাম, যুক্তরাজ্য প্রবাসী চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা.আশরাফুল ইসলাম , চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. কে জামান, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জেলার প্রথম ইপিসিএস অফিসার ও অতিরিক্ত সচিব

এএইচএম সাদিকুল হক, জেলার প্রথম সচিব ব্যারিস্টার এম হায়দার আলী, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. মোশাররফ হেসেন মিয়া, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. মোফাখখারুল ইসলাম, পিএসসি'র সাবেক সদস্য চিকিৎসা বিজ্ঞানী ড. সোহরাব আলী, আমেরিকা প্রবাসী ড. বেলায়েত হোসেন, প্রফেসর আসাদুজ্জমান, অবসর প্রাপ্ত উপসচিব ফেরদৌস পারভীন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক অতিরিক্ত সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব খন্দকার রাকিবুর রহমান, যুগ্মসচিব তাহমিনা বেগম, চিকিৎসা বিজ্ঞানী ড. মোঃ ফজলুর রহমান সহ অসংখ্য কৃতি ব্যক্তিত্ব স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত থেকে দেশ ও জাতির সেবা করে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য যে, শেরপুরের সাবেক জেলা প্রসাশক মোঃ আবুল হোসেন (২০০১), শেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (বর্তমানে শিক্ষা সচিব) কবি ও গবেষক ড. কামাল আব্দুল নাছের চৌধুরী (কামাল চৌধুরী), সাবেক জেলা প্রশাসক মোঃ নাসিরুজ্জামান শেরপুরের বর্তমান জেলা প্রশাসক বিশিষ্ট নজরুল গবেষক ও কবি মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (জাহাঙ্গীর জাকীর), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) গল্পকার ও চিন্তাবিদ মুহাঃ আকবর আলী, শেরপুর সদরের সাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ.এফ.এম হায়াতুল্লাহ (বর্তমানে পিএটিসি'র পরিচালক) শেরপুরের সাহিত্যাঙ্গনে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

তথ্যসূত্র: ক) ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি খ) বৃহত্তর ময়মনসিংহ গ্যাজেটিয়ার ও অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থাবলী।